বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৬ষ্ঠ বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ঃ বাস্তবতা ও বাস্তবায়ন

মেহেদী মাসুদ*

Abstract

Affairs of Chittagong Hill Tracts (CHT) occupies an important place in our national politics. Even after four years of the signing of the Peace Accord real peace, one has to admit, is yet to be achieved. There has arisen a lot of controversy in terms of the implementation of the Peace Accord. The peace process in the Hills may run into trouble if the Accord is not implemented properly. Because of the gathering storms on the Hills, political analysts already have started saying, is CHT Peace Accord the end of the conflict or the beginning of a tragedy ? The Parbatya Chattogram Jana Sanghati Samiti (PCJSS) is also doubtful of the hesitant course of the peace implementation which is evident in the special booklet published by them to commemorate the fourth year of the signing of the Accord. In this booklet the unimplemented issues are mentioned. Against this backdrop this paper examines the realities and prospects for implementing the peace Accord in Chittagong Hill Tracts.

ভূমিকা

জাতিগত বিরোধ স্নায়ু যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে যা বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি স্বরূপ । বিশ্বব্যাপী জাতিগত বিরোধের এই ব্যাপকতার কারণে বোধকরি আমরা এই পর্যবেক্ষণটি করতে পারি যে স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্বশান্তির প্রতি যেরূপ হুমকির কারণ ছিল বর্তমানে জাতিগত বিরোধ সেরূপ হুমকি হিসেবে বিরাজ করছে । এই প্রসংগে অধ্যাপক Hurst Hannum এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "Ethnic conflict has replaced the cold war as the primary interest of political and military theorists, and even conflicts that may be primarily political or economical in nature are frequently given an ethnic cast. Such conflicts pose substantial threats to international peace and human life"।[১] বিশ্বময় জাতিগত অশান্তির এই পরিব্যাপন আমাদের ক্রমাগত শংকিত করে তোলে। কেননা বিশ্বের মাত্র ২০টি রাষ্ট্রের জনগণ তুলনামূলকভাবে সমপ্রকৃতি সম্পন্ন। প্রতিবেশী ভারতেই প্রায় ৩৫০টি জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । নাইজেরিয়াতেও আনুমানিক ৪৫০টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে । আমাদের বাংলাদেশেও কমপক্ষে ৩৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা রয়েছে । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত এই জাতিসত্ত্বাগুলো আবার পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ - এই মেয়াদ কালে বিশ্বে মোট ৮২টি সংঘর্ষ/যুদ্ধ সংঘটিত হয় । তন্মধ্যে ৭৯টি সংঘর্ষ/যুদ্ধের কারণই ছিল জাতিগত অশান্তি[২]।

---

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

১. Hurst Hannum (1998), "The Specter of Secession: Responding to claims for Ethnic Self-Determination, Foreign Affairs, Vol. 77, March/April.
২. Anwar Husain, Syed (1999), "War and peace in the Chittagong Hill Tracts. Retrospect and Propect, Dhaka.

বর্তমান নিবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি ক্ষুদ্র পটভূমিসহ বিভিন্ন সরকারের আমলে এই সমস্যা নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে চুক্তির কার্যকারিতা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সরকারের উদ্যোগ

স্বাধীনতার জন্ম লগ্ন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট বহন করে আসছিল। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের ২৪২ নং ধারাটি বাতিল করা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকারকৃত ১৯০০ সালের হিল ট্রাক্টস রেগুলেশনের আওতায় যে বিশেষ অধিকারের মর্যাদা পার্বত্য চট্টগ্রাম ভোগ করত তা সম্পূর্ণভাবে রদ হয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘুদের অধিকার বঞ্চনার অধ্যায় তখন থেকেই শুরু হয়। ১৯৫৭ সনে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে প্রায় ১ লক্ষ উপজাতি আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। ৫৪ হাজার একর জমি জলের নীচে তলিয়ে যায়। তদানীন্তন সরকার ক্ষতিগ্রস্ত চাকমাদের জন্য যে পুনর্বাসনের ব্যবস্হা করে তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। ফলে উপজাতীয়রা খুব ক্ষুব্ধ হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে উপজাতীয়দের বাঙ্গাঁলী হিসেবে আখ্যায়িত করা হলে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গঁত উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেঁ সাক্ষাৎ করে কিছু দাবি দাওয়া পেশ করেন ঃ ১) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ২) ১৯০০ সনের হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন বহাল করা ৩) ১৯০০ সনের রেগুলেশনের ধারা পরিবর্তন না করার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-পাহাড়ীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।[৩] কিন্ত এই দাবীগুলো প্রত্যাখ্যাত হলে উপজাতীয় জন-গোষ্ঠী ধীরে ধীরে সহিংসতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জন সংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) নামে একটি দল আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৩ সনের ৭ই জানুয়ারী এই দলেরই সশস্এ শাখা শান্তি বাহিনী গঠিত হয়। শান্তিবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত প্রথম অপারেশনটি পরিচালিত হয় ১৯৭৫ সনের প্রথমার্ধে। রাঙ্গামাটি শহর হতে ১২ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্বে অবস্হিত শুভলং এ একটি পুলিশ পেট্রোল টিমের উপর সেই সময় শান্তি বাহিনী হামলা চালায়।[৪] শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হতে থাকে। ১৯৭৩ সনে তিনি রাঙ্গামাটিতে এক নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নিঃশর্তভাবে পাহাড়ী জনগণের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলেন।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন। প্রাথমিকভাবে এই উদ্যোগগুলোর বেশীর ভাগই ছিল অর্থনৈতিক। চিটগাং হিল ট্রাক্টস ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সনের জানুয়ারী মাসে।

---

৩. Murtaza Ali, Syed (1996) The Hitch in the Hills CHT Diary.
৪. Anwar Hussain, Syed (1999) Ibid.

এছাড়া ১৯৭৯ সনে একটি Multisectoral Development Programme এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। এই কর্মসূচির জন্য প্রাথমিক বরাদ্দ ছিল ৬,২৪২.৬৬ লক্ষ টাকা। ১৯৯২ সনে এই বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩,৭৬৬.৩৮ লক্ষ টাকা। ১৯৭৬ এর অর্ডিন্যান্স এর নং LXXII অনুযায়ী বোর্ডের প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(১) স্থায়ী ভিত্তিতে ভূমিহীন জুম পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
(২) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ ও অন্যান্য সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করা;
(৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়ক সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা;
(৪) আয়মূলক কর্মকান্ডের জন্য জনগণে.র জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা;
(৫) পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের জন্য সামাজিক সংগঠন স্থাপন করা। পাশাপাশি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা;
(৬) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য সাহায্য প্রদান;
(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হোস্টেল নির্মাণ ও উচ্চশিক্ষা উৎসাহিত করতে ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

১৯৭৬ সনে বোর্ড যৌথ খামার প্রকল্প নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জুমচাষী ও অন্যান্য ভূমিহীন পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ভূমিহীন পরিবারগুলোর প্রত্যেকটি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় ৫ একর করে জমি পায় কৃষিকাজের জন্য। আশা করা হয়েছিল আগামী তিন বছরের মধ্যে তাঁরা চাষাবাদ ও কৃষিজাত পণ্যের বিপণনের মাধ্যমে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করবে। এ ধরনের মোট আটটি যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

১৯৭৭ সনে উপজাতি সম্মেলন নামে একটি রাজনৈতিক ফোরাম গঠিত হয়। শুরুতেই এই সম্মেলনের মাধ্যমে সরকার জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সফল হন। জনসংহতি সমিতিও এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তী কালে জনসংহতি সমিতি অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে এই সংলাপ থেকে পিছিয়ে আসে। ১৯৭৯-৮১ সালে সরকার সমতলের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন বাঙ্গালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করার প্রচেষ্টা চালায়। এটি ছিল একটি বিতর্কিত উদ্যোগ।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে উপজাতীয়দের জন্য সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫% কোটা প্রবর্তন করা হয়। অধিকন্তু, এই ৫% কোটার বাইরেও অতিরিক্ত ১,৮৭৭ টি পদ উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত করা হয় ১৯৮৮ সনে। এসবই করা হয় আলোচনার টেবিলে জন সংহতি সমিতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত মোট ৬ বার জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সব বৈঠকের প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সনে তিন পার্বত্য জেলায়

স্হানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। এর আগে ১৯৮৪-১৯৮৫ অর্থ বছরে একটি বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তিন পার্বত্য জেলার জন্য ।

এরশাদ সরকারের আমলে মোট চারবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় । এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় এপ্রিল, ১৯৮৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ পর্যন্ত মোট ২,২৯৪ জন বিদ্রোহী উপজাতীয় আত্মসমর্পন করে । এতসবের পরেও সার্বিক চিত্র খুব একটা আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠতে পারেনি ভারতীয় সরকারের অসহযোগিতার কারণে । এরশাদ সরকারের সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৯৮৫ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করা । এর আওতায় নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করা হয় ঃ

(১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য কর মওকুফ ;
(২) মূলধনী যন্ত্রাংশের আমদানীর জন্য ফি প্রত্যাহার ;
(৩) কোন প্রকল্প চালু হওয়ার পর মাত্র ৫% হারে ১০ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সুবিধা ;
(৪) বিদ্যুৎ/গ্যাসের হ্রাসকৃত মূল্য ;
(৫) ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে সুদের হার ৫% হ্রাস করা ;
(৬) উপজাতি ও অ-উপজাতিদের যৌথ কারবারে উৎসাহিত করা ;
(৭) ১২ বছরের জন্য কর অবকাশ ; ও
(৮) প্রদর্শনী কেন্দ্রগুলোর জন্য শুল্ক ও প্রমোদ কর প্রত্যাহার ।

পাশাপাশি এ সময় রাজনৈতিক সমঝোতার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়।১৯৮২ সনে উপেন্দ্র লাল চাকমাকে প্রধান করে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয় এই লক্ষ্যে । কিন্তু জনসংহতি সমিতি এই কমিটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ইতোমধ্যে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে নিহত হলে সরকারের পুরো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় । পরবর্তীতে আগষ্ট, ১৯৮৩ সনে উপজাতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয় । ১৯৮৫ সনের অক্টোবর মাসে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির বৈঠক হয় । এই বৈঠকে কোন অগ্রগতি হয়নি । ১৯৮৭ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হয় । একই বছরের ১৭-১৮ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের দ্বিতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় । সমিতি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন সহ পাঁচ দফা দাবী এই বৈঠকে পেশ করে যা তদানীন্তন সরকার সংবিধান সম্মত নয় বলে জানান । সরকার ১৯৮৮ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে পর পর দুইটি বৈঠক করেন জনসংহতি সমিতির সাথে । পঞ্চম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় একই বছরের জুন মাসে। আগের মতই এই বৈঠকটিও ছিল নিস্ফলা। এমতাবস্হায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নয় দফা সুপারিশ পেশ করে। এই নয় দফা সুপারিশ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা সমর্থিত ছিল। ১৯৮৮ সনের ২৯ শে আগষ্ট থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত তিনটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় কমিটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈঠক করেন। মোট ৪৯ জন উপজাতীয় নেতা এই বৈঠকসমূহে উপস্হিত ছিলেন।

ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় । সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অন্যান্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকা করে। ফলে সমিতি ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে ষষ্ঠ বৈঠক আয়োজনে রাজি হয় । এই বৈঠকে সমিতি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বদলে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করে । কিন্ত অন্যান্য দাবীগুলো অপরিবর্তিত থাকে। সরকারপক্ষও তাঁর নয় দফা সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য সমিতিকে অনুরোধ জানায় । প্রাথমিকভাবে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে উপেন্দ্র লাল চাকমা, আহবায়ক, লিয়াজো কমিটির অনুরোধে সমিতি এটা ভেবে দেখবে বলে জানায় । সপ্তম বৈঠকটি সমিতির অসহযোগিতার কারণে হতে পারেনি । সমিতির নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে কোনরূপ সাড়া না পেয়ে সরকার ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলায় স্হানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে । এই পর্যায়ে শান্তি বাহিনী হুমকি প্রদান করে যে এই পরিষদ সমূহ বাতিল করা না হলে তারা আলোচনায় বসবেন না । সরকার তাদের এই দাবী মেনে না নিলে পরিস্হিতি আরো অশান্ত হয়ে উঠে । হানাহানি ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে ।

১৯৯০ এর গণ **আত্মসমর্পণ** এরশাদের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হন । এই সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন । সেই সাথে এটাও ঘোষণা করা হয় যে শান্তিবাহিনী সদস্য যারা অস্ত্রসমেত আত্মসমর্পণ করবেন তাঁদের জন্য নগদ অর্থ প্রদানের বিধান থাকবে । এই বরাদ্দটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রতিটি এল,এম,জি	ঃ টাকা ৩০,০০০.০০
প্রতিটি মর্টার	ঃ টাকা ৩০,০০০.০০
প্রতিটি এস,এম,জি	ঃ টাকা ২৫,০০০.০০
প্রতিটি এস,এম,সি	ঃ টাকা ২২,০০০.০০
প্রতিটি সেমি অটোরাইফেল	ঃ টাকা ২০,০০০.০০
প্রতিটি রকেট লাঞ্চার	ঃ টাকা ২০,০০০.০০
প্রতিটি রাইফেল (বোল্ট অ্যাকশন)	ঃ টাকা ১২,০০০.০০
প্রতিটি পিস্তল/রিভলভার	ঃ টাকা ৭,০০০.০০
প্রতিটি ওয়্যারলেস সেট	ঃ টাকা ১০,০০০.০০ থেকে ২০,০০০.০০
প্রতিটি গ্রেনেড	ঃ টাকা ১,০০০.০০
প্রতিটি এক্সপ্লোসিভ (এক পাউন্ড)	ঃ টাকা ৫,০০.০০
প্রতিটি বুলেট	ঃ টাকা ৫.০০
প্রতিটি কার্ট্রিজ	ঃ টাকা ৫.০০

এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় মোট ৪২ জন শান্তি বাহিনী সদস্য আত্মসমর্পণ করেন । তন্মধ্যে ২৪ জন সশস্ত্র ছিলেন ।

বেগম খালেদা জিয়া পার্বত্য সমস্যা সমাধানে একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেন। ১৯৯৩ সালে এই কমিটি শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনা শুরু করে। এসবের প্রেক্ষিতে প্রায় ৫ হাজার উদ্বাস্তু দেশে ফিরে আসে।

১৯৯০-৯২ সালে মোট ১২,০০০ উপজাতি পরিবার পুনর্বাসিত হয়। এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৩১১.০৮৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য ও ৬৪.৮০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি পরিবার এর আওতায় এককালীন ১৬,০০০.০০ টাকা ও প্রতি সপ্তাহে ২১ কেজি হারে খাদ্য শস্য পেয়েছে ছয় মাস পর্যন্ত।[৫]

এই সব কর্মসূচি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চাকমা শরণার্থী এসময় ভারত থেকে ফিরে আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডিসেম্বর,১৯৯১ ও জানুয়ারী, ১৯৯২ সালে ভারত থেকে ফিরে আসা চাকমা শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১,০৩৪ জন। পক্ষান্তরে নভেম্বর, ১৯৯১ সনে ভারত ফেরত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ জন। সুতরাং সার্বিক চিত্র আশাব্যঞ্জক ছিল। ১০ই আগষ্ট, ১৯৯২ সনে জনসংহতি সমিতি একতরফা অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করলে পরিস্থিতি আরো ভালো হতে থাকে।

কর্ণেল অলি আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় কমিটি মোট ৭ বার জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠক করে। ১৯৯৪ সনের মধ্যভাগে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার (বাংলাদেশ, জনসংহতি সমিতি ও ভারত) মাধ্যমে উপজাতি শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সফল ভাবে শুরু হলেও, তা ১৯৯৫ এর প্রথম অর্ধে আকস্মিক ভাবে থেমে যায়।

১৯৯৬ সনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকটের একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারেই ছিল। ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ কে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। জন সংহতি সমিতির সাথে জাতীয় কমিটি মোট ৭টি বৈঠকে মিলিত হয়। এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম বৈঠকটি খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বাদবাকী ৬টি বৈঠকই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যতগুলি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সবগুলিই পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্মতি প্রদান এটাই প্রমাণ করে যে শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি জন সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অনেক বেশী আস্থাবান। আর এই আস্থার প্রতিফলন ঘটে ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে।

চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ

১। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ঃ দেশের সংবিধানের আওতায় ভূ-খন্ডগত ঐক্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয়।

৫. Anwar Hussain, Syed (1999) Ibid, Page-55.

চুক্তির সূচনায় বলা হয় " ....সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ....।" সাধারণভাবে বলা যায় যে শান্তি চুক্তিটি হল পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের দাবী-দাওয়ার নিরিখে সংবিধানের আওতায় একটি রূপরেখা । আর এই রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিন জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে । পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা (উপজাতি ও অ-উপজাতি) হল ২২ জন । পরিষদের একজন চেয়ারম্যান থাকবেন এবং তিনি জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন । তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন এবং তিনি অবশ্যই একজন উপজাতি হবেন । এ ছাড়া উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) থাকবেন ১২জন ; উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) ২ জন ; অ-উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ) ৬জন ও অ-উপজাতীয় সদস্য (মহিলা) থাকবেন ১জন। জেলা পরিষদের সদস্যগণও পদাধিকার বলে সদস্য হবেন ।

নির্বাচন ঃ পরিষদের সকল সদস্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন । তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন ও ভোট প্রদান করতে পারবেন। আঞ্চলিক পরিষদে সরকারের যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন । একজন উপজাতীয় কর্মকর্তাকে এই পদে অগ্রাধিকার দেয়া হবে ।

পরিষদের কার্যাবলীঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পরিচালিত সকল কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে এই আঞ্চলিক পরিষদ । পরিষদ জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করবে । সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুত প্রকল্প, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্প কারখানা ও সরকারের অধিকারে থাকা ভূমি - এই সবের উপরে পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবেনা । পরিষদ করারোপ, টোল সংগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার ফি নির্ধারণ ও তা আদায় করার ক্ষমতা ভোগ করবে । পরিষদ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার উর্দ্ধে নয় এমন নিয়োগ দান করতে পারবেন। এই সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে । স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রভৃতিও পরিষদের কার্যাবলীর **অন্তর্ভুক্ত** । উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচারকার্য পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় থাকবে । এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত **মন্ত্রী হবেন একজন উপজাতি** । জমি জমা

সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন করা হবে ।

৩। পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ঃ চুক্তির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন । চুক্তি অনুযায়ী যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করবে ও গোলা-বারুদ জমা দেবে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে । এই লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতি চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে তাদের ক্যাডারদের নামের তালিকা ও গোলা-বারুদের তালিকা সরকারের নিকট পেশ করবে । যে সব শান্তি বাহিনী সদস্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । আত্মসমর্পণকারী/ প্রত্যাবর্তনকারী সদস্যদের জন্য সরকার পরিবার পিছু এককালীন ৫০ হাজার টাকা প্রদান করবে । সরকারও পর্যায়ক্রমে ছয়টি সেনানিবাস ছাড়া অন্য সকল সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার করে নিবে । এ ছাড়া সরকার যেসব উপজাতির কোন জমি নাই সে সব উপজাতীয় পরিবারকে পরিবার প্রতি ২ একর জমি প্রদান করবে ।

চুক্তি মূল্যায়ন

জনগণ শান্তিকামী । সভ্যতার অগ্রগতির সাথে শান্তি-সমৃদ্ধির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে । যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত কোন জাতি সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করতে পারেনা । যুদ্ধের কারণেই প্রাচীন সভ্যতাগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে । মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চগুলো Truce of God বা ঈশ্বর-নির্দেশিত যুদ্ধ বিরতি নামে এক প্রথা জারী করে সামন্ত প্রভুদের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করত । ১৬৪৮ সালে স্বাক্ষরিত ওয়েস্টফ্যালিয়া শান্তিচুক্তি অনুযায়ী ইউরোপে ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে । অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষের কারণে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রবল হয় । দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে । জেরেমী বেন্থাম, ইমানুয়েল কান্ট, হুগো গ্রোটিয়াস, ওপেনহেইম প্রমুখ দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণেতাগণ শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা বলেন । আধুনিক কালেও জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত Peace-keeping, peace-making প্রভৃতি কর্মসূচি শান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । International Confidence Building Measures (ICBM) শান্তি স্থাপনের প্রাথমিক করণীয় হিসেবে ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হচ্ছে । যুদ্ধ বিরোধী সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও শান্তি আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে । ১৯৮৩ সনে ইউরোপের শান্তি আন্দোলন ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হবে ।

সভ্য বিশ্বের সর্বত্রই দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে প্রতিনিয়ত নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে । সংহতির বীজ মন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে উন্নত দেশসমূহ এগিয়ে চলছে । এই জাতীয় সংহতির প্রতিফলন রূপেই ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ এ স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চলরূপে স্বীকৃতি পেল । সংবিধান এর ধারা ৯ এ বলা হয়েছে "The state shall encourage local government institution composed of representatives of the areas concerned." সংবিধানের ২৮(৪) নং ধারায় বলা হয়েছে Nothing in this article shall prevent the State from making special provision in favour of women or children or for the advancement or any back ward section of citizen".

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ক, খ, গ ও ঘ এই চারটি ভাগে বিভক্ত । ক ভাগের ৪ নং বিধি অনুযায়ী এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হতে সম্পাদিত ও সই করার তারিখ হতে বলবত হবে । বলবত হওয়ার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ যা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবত থাকবে । চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ এর আগে পার্বত্য জেলা স্হানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ কার্যকর ছিল । পার্বত্য জেলা স্হানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর বিভিন্ন ধারা সমূহের পরিবর্তন, সংশোধন, অবলোপন ও সংযোজনের বিষয়ে এক মত হয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । কোন আইনের পরিবর্তন, সংশোধন, অবলোপন ও সংযোজন করা নতুন কোন আইন প্রণয়নের শামিল । আমরা জানি সংবিধানের ৮০ নং ধারানুযায়ী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের । চুক্তিটি যেহেতু জনগুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এটা সংসদে আনা উচিত ছিল ।

চুক্তির খ-অংশের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানটি সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করেছে । কেননা চুক্তির এই অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তরের জন্য পরিষদের পূর্ব সম্মতিকে শর্ত হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে । অথচ সংবিধানের ১৪৩ নং ধারানুযায়ী আইন সঙ্গত ভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পত্তি সমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হবে ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্হ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্হ মহাসাগরের অন্তঃস্হ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্য সম্পন্ন সামগ্রী ও গ) বাংলাদেশে অবস্হিত প্রকৃত মালিক বিহীন যে কোন সম্পত্তি । কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী বলা চলে পার্বত্যাঞ্চলে কোনরূপ জমি হস্তান্তর চলবেনা । অধিকন্তু, পার্বত্যাঞ্চলের সমুদয় ভূমি ও জমির অন্তঃস্হিত খনিজ সম্পদের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী হল পরিষদ ।

বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম অংশের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি একক বা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যেখানে প্রশাসন যন্ত্রের সকল অংশেই সরকারের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে । কিন্তু চুক্তির ফলে দেশের

একক ও এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটেছে। কেননা বাংলাদেশের ৬১ টি জেলা যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে ৩টি পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে না । আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে এটা সরকারের সমান্তরালে কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন ।

চুক্তির গ - অংশের ১৩ নং অনুচ্ছেদটিও সংবিধান সম্মত নয় । চুক্তির ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রয়োগ করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন ।" বিপরীতে সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে । সংবিধানের আওতায় পরিষদ কোন বিধি প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু সংবিধান কখনো কোন সংস্থার দ্বারস্থ হতে পারেনা আইন প্রণয়নের জন্য ।

চুক্তির ঘ - অংশে বর্ণিত আছে যে ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান করে একটি ভূমি কমিশন গঠন করা হবে । এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে ও এর বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবেনা । চুক্তির এই অংশটিও সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। কেননা কমিশনের কোন না কোন সিদ্ধান্তে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লংঘিত হতে পারে । অধিকন্তু, সুপ্রীম কোর্টকে ডিঙ্গিয়ে কোন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারেনা ।

চুক্তির বাস্তবায়ন

কোন চুক্তিই শতভাগ ত্রুটিমুক্ত নয়। কোন পক্ষের পুরোপুরি সন্তুষ্টি সাধনও এই ধরনের শান্তি চুক্তিতে সম্ভব নয় । কেননা সমঝোতার ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের কোন স্থান নেই । মোদ্দা কথা হলো উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সহিংসতা ছেড়ে শান্তি উদ্যোগের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে । যার প্রতিফলন ঘটেছে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে চারটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সে তুলনায় শ্লথ । ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিল আকারে পাশ করার পর মুহূর্ত থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ তদানীন্তন আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তি লংঘনের অভিযোগ করে আসছে । রূপায়ন দেওয়ান, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই প্রসঙ্গে বলেন, " অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে লংঘন করে ১২ই মার্চ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৪০টি সংশোধনী করে, পরিবর্তন করে অর্থাৎ চুক্তি অমান্য করে ওখানে (জাতীয় সংসদ) বিল উত্থাপন করা হয়েছিল।"[৬]

৬। দেওয়ান রূপায়ন (১৯৯৯) "সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বাস করে আমরা চুক্তি করেছি" মেসবাহ কামাল ও শারমিন মৃধা সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্কট ও সম্ভাবনা। ঢাকা: গভেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ।

চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজ চুক্তির মৌলিক শর্তগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে দেখা দিয়েছে শংকা। শান্তি চুক্তির অন্তত সাতটি মৌলিক শর্ত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগহীনতার **ফলে** স্থবির হয়ে আছে । এগুলো হলোঃ ১) পার্বত্যাঞ্চলের শুধুমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে একটি নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা ২) পাহাড় থেকে সেনাবাহিনী, আনসার ও ভিডিপির সব ধরনের অস্থায়ী ছাউনী গুটিয়ে নেয়া ৩) জটিল ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন গঠন ও পাহাড়ের জমির বিরোধ নিষ্পত্তি করা ৪) পার্বত্য চট্রগ্রামের অভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তু ও ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী পুনর্বাসন ৫) পাহাড়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অভিবাসিত বাঙ্গালী সেটলারদের পার্বত্যাঞ্চলের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ৬) পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্বভুক্ত মোট ৩৩ টি বিষয় কার্যকর করা ও ৭) পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে কার্যকর করা ।[৭]

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে চুক্তির যেসব শর্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন, পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, উন্নয়ন বোর্ডের চেয়াভম্যান পদে একজন উপজাতীয়কে নিয়োগ, ভারত থেকে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্কফোর্স গঠন, বহুমুখী উন্নয়নে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ, চাকরী ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য কোটা সংরক্ষণ, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও অস্এ জমাদানকারীদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা নগদ প্রদান ও মাসিক রেশন প্রদান, অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহার, সমিতির প্রত্যাগত সদস্য ও তাঁদের পরিবারভুক্ত ৭১ জনকে চাকরীতে পুনর্বহাল, সমিতির ৭০৫ জন সদস্যকে পুলিশের কনস্টেবল ও ১০ জনকে সার্জেন্ট পদে নিয়োগ দান, পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিভাগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমিতির সদস্যদের নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরাপত্তা বাহিনীর ৭০টি ক্যাম্প প্রত্যাহার, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন ও একজন উপজাতীয় মন্ত্রী নিয়োগ ও উক্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন । উপর্যুক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় আবার পূর্ণাঙ্গঁরূপে বাস্তবায়িত হয় নাই । সেগুলো হলো ঃ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা চূড়ান্তকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্যাকেজ সুবিধা প্রদান, পার্বত্য তিন জেলায় ভূমি জরীপের কাজ শুরু করে ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা ও ভূমিহীন পরিবারগুলোকে দুই একর করে জমি প্রদান, ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ঋন মওকুফের বাবস্থা করা, গত ১০ বছরে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় নাই এমন জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা, জনসংহতি সমিতির ঋচ গ্রহণকারী সদস্যদের ঋণ মওকুফের বাবস্থা করা, সমিতির সদস্যদের আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ প্রদান ।

৭। দৈনিক ভোরের কাগজ, ২/১২/২০০১

শান্তি চুক্তির মৌলিক শর্তগুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্যাঞ্চলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে । আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরাসরি সেনা হস্তক্ষেপ ঘটছে। " অপারেশন দাবানল " এর পর সেখানে শুরু হয়েছে " অপারেশন উত্তরণ " নামে নতুন সেনা অভিযান । প্রত্যাগত ৩০৫৫ টি শরণার্থী পরিবার অদ্যাবধি নিজেদের জায়গা জমি ফেরত পাননি । এ ছাড়া জনসংহতি সমিতির অভিযোগ, শান্তি চুক্তির বিরোধিতাকারী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) হামলায় এ পর্যন্ত সমিতির ৩৮ জন সদস্য ও সমর্থক নির্মম ভাবে খুন হয়েছেন । অন্যদিকে ইউপিডিএফ এর পাল্টা অভিযোগ, শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করায় গত চার বছরে সমিতি ও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থকদের হামলায় ইউপিডিএফ-এর খুন হয়েছেন ৬০ জন, কারাবন্দী রয়েছেন প্রায় ২০০ নেতা-কর্মী ।[৮]

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান - এই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচথ গত এক দশকেও না হওয়ায় এর প্রশাসনিক কার্যক্রম জনপ্রতিনিধিত্বশীল হয়ে ওঠেনি। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধি মালা ও কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়নে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গড়িমসির কারণে এ পরিষদটিও পুরোপুরি কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি । ফলে পার্বত্য জেলা সমূহে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন, স্থানীয় সংস্থা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ।

চুক্তি সম্পাদনের পর আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে মাত্র চারটি বৈঠক করেছে । এরপর অর্থাৎ ১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০১ সালে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি । তদানীন্তন সরকারের পক্ষ থেকে আরো উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া উচিত ছিল এই ক্ষেত্রে । চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে ঠান্ডা লড়াই শুরু হল এক পর্যায়ে।

তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল বিএনপি চুক্তি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে কট্টর অবস্থান গ্রহণ করে । ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত লংমার্চ করে চুক্তি সম্পাদনের প্রতিবাদ জানিয়েছিল তারা । অবশ্য এখন তাঁরা সরকার গঠনের পর শান্তি চুক্তি ইস্যুতে আগের সেই অনড় অবস্থান থেকে সরে এসেছে বলে বিশ্লেষকগণের অভিমত । সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া বলেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট শান্তি চুক্তি বাতিল করবেনা । তবে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে পুরো চুক্তিটি পর্যালোচনা করার পর এতে প্রয়োজনীয় কয়েকটি সংশোধনী আনা হবে । বিএনপি-র প্রাক নির্বাচনী ইশতেহারেও একই কথা বলা হয়েছে ।[৯]

পার্বত্য শান্তি চুক্তির চতুর্থ বর্ষ পূর্তি হলো গত ২রা ডিসেম্বর, ২০০১ সালে ।

৮। দৈনিক ভোরের কাগজ, প্রাগুক্ত।
৯। দৈনিক ভোরের কাগজ, প্রাগুক্ত।

চতুর্থ বর্ষ পূর্তিতে জনসংহতি সমিতি তাদের এক প্রকাশনায় বলেছে,শান্তি চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় আগের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে । দিন দিন এই পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক হচ্ছে । ব্যাহত হচ্ছে পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন । বেকার সমস্যা প্রকট হয়েছে, ভূমির বিরোধ বাড়ছে । এ ছাড়া চুক্তি লংঘন করে Settler-দের পাহাড়ের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভোটার তালিকাভুক্ত করায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে । জনসংহতি সমিতির এই দলীয় প্রকাশনাটিতে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় ।

চুক্তির বিভিন্ন বিষয় বর্তমানে খতিয়ে দেখছে আইন মন্ত্রণালয় । পার্বত্য চুক্তির বিভিন্ন ধারা সরকার বাস্তবায়ন করছেনা বলে অভিযোগ জানালেও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেছেন, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে আপাতত তাদের কোন সিদ্ধান্ত নেই । বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এডিবি, ডানিডা, ইউএসসএইডসহ বেশ কয়েকটি দাতা সংস্থা তাদের প্রতি চুক্তি সংশোধনের কোন উদ্যোগ না নেয়ার আহবান জানিয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীর সাথে আলাপকালে আশংকা ব্যক্ত করে বলেছেন, এ উদ্যোগ আবারো পার্বত্যাঞ্চলে অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।[১০] সমিতির প্রধান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমা ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, চুক্তির ব্যাপারে তার কিছু বলার নেই। তিনি শুধু চান চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ।[১১]

ইউএনডিপি, এডিবি, বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ প্রতিনিধিরা সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এ চুক্তির ভবিষ্যত নিয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। সরকার পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে দাতাদের কথার প্রতি জোর দিয়েছে । যদি চুক্তি সংশোধন করা হয় তাহলে এ অঞ্চলের জন্য উন্নয়ন সাহায্য নাও আসতে পারে- এই আশঙ্কায় তারা আপাতত চুক্তি সংশোধন করছে না। তবে আইন মন্ত্রণালয় চুক্তির বিভিন্ন ধারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। চুক্তি সংশোধন করতে সরকার আরো সময় নিতে চায় বলেও জানা গেছে ।[১২]

উপসংহার ঃ

আমরা একথা জানি যে Majority must be the custodian of minority rights. সংখাগুরুরা সংখ্যালঘুদের দায়-দায়িত্ব বহন করবে, নিশ্চিত করবে তাদের অধিকার । পাহাড়ী জনগণ বাংলাদেশেরই সন্তান । পাহাড়ী-বাঙ্গালী সম্প্রীতির ধারাটি ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠুক - এটা মনে রেখে নব নির্বাচিত বিএনপি সরকারের দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলা উচিত । জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

১০। দৈনিক ইত্তেফাক ০৪-০৪-২০০২।
১১। দৈনিক ইত্তেফাক প্রাগুক্ত।
১২। দৈনিক ইত্তেফাক প্রাগুক্ত।

রূপায়ণ দেওয়ান এই প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেন, "আমাদের আন্দোলন বাংলাদেশে যে আন্দোলন তার মূল স্রোত ধারা থেকে কোন দিন বিচ্ছিন্ন ছিলনা । আমরা কোন দিন বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা করি নাই। আজকে আমি জনসংহতি সমিতির পক্ষে এই জিনিসটা অকপটে বলতে চাই, আমরা দেশেরই মানুষ। দেশের স্বার্থ আমাদের স্বার্থ । দেশের সন্তান হয়ে সুযোগ্য সন্তান হিসাবে আমরা দায়িত্ব পালন করতে চাই ।"[১৩]

দীর্ঘ প্রায় দুই দশকেরও বেশী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সেখানে সহিংসতার অবসান ও পাহাড়ী জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন নিশ্চিত করার একটি সোপান রচিত হয়েছিল । কিন্তু চুক্তির মূল শর্তগুলোর বাস্তবায়ন যথাযথ না হওয়ায় বিভ্রান্তি দেখা দেয় । পাহাড়ীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ চুক্তির বিরুদ্ধে চরম অবস্হান নিয়েছে । ফলে পরিস্হিতি দিন দিন জটিলতর হচ্ছে ।

স্যামুয়েল পি, হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত "The clash of civilization" নামক প্রবন্ধে একটি মৌলিক চিন্তা উপস্হাপন করেন, "এটা আমার বিশ্বাস যে নতুন এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতের সংঘাত গুলো আদর্শ বা অর্থনীতির জন্য হবেনা, হবে সাংস্কৃতিক । মানুষে-মানুষে পার্থক্য ও সংঘাতের প্রধান কারণ হবে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা । জাতীয় রাষ্ট্রগুলো হয়তো আগামীতেও শক্তিশালী ভূমিকায় অবিচল থাকবে কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারী জাতিতে-জাতিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সংঘাত সৃষ্টি হবে । আগামীতে সভ্যতার এই সংঘাতই বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাধান্য পাবে । বিভিন্ন সভ্যতার পারস্পরিক পার্থক্যের রেখাগুলোই হবে আগামীর যুদ্ধ রেখা ।" পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার-এ যাতে আঘাত না লাগে সে ব্যাপারে বাঙ্গালীদের সতর্ক ও সচেষ্ট হতে হবে । উন্নত বিশ্বেও আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণের নজির রয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল নগরীর নাম করণ করা হয়েছে একজন আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান চীফ Sealth এর নামানুসারে ।

পূর্বের আলোচনায় দেখেছি বর্তমান সরকারের স্হানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী শান্তি চুক্তির ব্যাপারে কথা বলেছেন ও চুক্তিটি পর্যালোচনা করা হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন । চুক্তি বাতিলের কথা তিনি বলেন নি ।বিশ্লেষকগণ আশা করছে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নে যেন কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা না দেয় সেটা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব । কেননা সরকারের মৌলিক কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন । পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি সকলের অভিন্ন স্বার্থ । এখানে আবার সন্ত্রাস ও হানাহানি-র প্রত্যাবর্তন কারো কাম্য নয় ।

১৩। কামাল মেসবাহ ও মৃধা শারমিন প্রাগুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ (১৯৯৭), বাংলাদেশ ১৯৯৬ ঃ রাজনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি । ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী ।

২। আহমদ এমাজউদ্দীন (১৯৯৮), শান্তি চুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ । ঢাকাঃ ইনফো পাবলিকেশনস ।

৩। কামাল মেসবাহ ও মৃধা শারমিন (১৯৯৯) সম্পাদিত, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট সম্ভাবনা । ঢাকা ঃ গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ ।

৪। চাকমা সুগত (১৯৯৩), পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি । রাঙ্গাঁমাটি ।

৫। দৈনিক ভোরের কাগজ, ২/১২/২০০১ ।

৬। Ali Murtaza, Syed (1996), THE HITCH IN THE HILLS CHT DIARY.

৭। AMENA MOHSIN (1997), THE POLITICS OF NATIONALISM The case of the Chittagong Hill Tracts. Dhaka: University Press Ltd.

৮। Anwar Husain, Syed (1986), Insurgency in the Chittagong Hill Tracts : Problem of Ethnic Minorities in Bangladesh : Asian Studies, Vol.4, No.1.

৯। Anwar Husain, Syed (1999), War and Peace in the Chittagoing Hill Tracts Retrospect and Prospect. Dhaka : Agamee Prakashani.

১০। Hurst Hannum (1998), The Specter of Secession : Responding to claims for Ethnic Self-Determination. Foreign Affairs, Vol.77, No.2.

১১। Martin O. Heisler (1977), Ethnic Conflict in the World Today, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.33.